

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৪

সূরা যুমার ১-৯

সূরা আয-যুমার কুরআনের ৩৯তম সূরা। এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর আয়াত সংখ্যা ৭৫ টি। অন্যান্য কয়েকটি মক্কী সূরার ন্যায় এরও বিষয়বস্তু আল্লাহপাক ও মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থান। আল্লাহর একত্ব ও সর্বশ্রেষ্ঠতা এবং তার প্রতি আনুগত্যের গুরুত্ব ও ব্যতিক্রমের পরিণতি এই সূরায় ব্যাখ্যায়িত। যুমার শব্দের অর্থ দল-বদ্ধ জনতা। দল শব্দটি দিয়ে জালাতবাসী ও জাহান্নামবাসী - মানুষের এই দুটি দলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নামকরণ

আয়াত নম্বর ৭১ ও ৭৩ وَسَيَقُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَأَبْوَ وَسَيَقُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا থেকে সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ এটি সে সূরা যার মধ্যে ‘যুমার’ শব্দের উল্লেখ আছে।

নাযিলের হওয়ার সময় কাল

এ সূরা যে হাবশায় হিজরত করার পূর্বে নাযিল হয়েছিল, সে ব্যাপারে ১০ নম্বর আয়াত থেকে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। কোন কোন রেওয়াযাতে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব ও তার সংগী সাথীগণ হাবশায় হিজরতের সংকল্প করলে তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

হাবশায় হিজরতের কিছু পূর্বে মক্কায় পরিবেশ ছিল জুলুম - নির্যাতন এবং শত্রুতা ও বিরোধিতায় ভরা। ঠিক এ পরিবেশে এ গোটা সূরাটিকে একটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতারূপে পেশ করা হয়েছে। এটা একটা নসীহত। এতে মাঝে মাঝে ঈমানদারদের সম্বোধন করা হলেও বেশীরভাগ কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের সম্বোধন করা হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, মানুষ যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করে এবং তার আল্লাহপ্রীতিকে অন্য কারো দাসত্ব ও আনুগত্য দ্বারা কলুষিত না করে। এ মৌলিক নীতিকে বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে অত্যন্ত জোরালো পন্থায় তাওহীদের সত্যতা এবং তা মেনে চলার উত্তম ফলাফল আর শিরকের ভ্রান্তি ও তা আঁকড়ে ধরে থাকার মন্দ ফলাফল অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া মানুষকে ভ্রান্ত আচরণ পরিত্যাগ করে আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঈমানদারদেরকে পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, যদি আল্লাহর দাসত্বের জন্য একটি জায়গা সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাঁর এ পৃথিবী অনেক প্রশস্ত। নিজের দীনকে রক্ষা করার জন্য অন্য কোথাও চলে যাও। আল্লাহ তোমাদের ধৈর্যের পুরস্কার দান করবেন। অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন একদিন না একদিন তোমাদেরকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, এমন দুরাশা কাফেরদের মন থেকে দূর করে দাও এবং পরিস্কারভাবে বলে দাও যে, আমার পথ রোধ করার জন্য তোমরা যা কিছু করতে চাও করো, আমি আমার কাজ চালিয়েই যেতে থাকবো।

পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার অধিকাংশ বিষয় প্রিয়নবী রাসূল সাঃ এর রেসালাত সম্পর্কিত ছিল। আর এ সূরার অধিকাংশ বক্তব্য তাওহীদ সম্পর্কিত। যারা তাওহীদে বিশ্বাস করে। তাদের জন্য পুরস্কার এবং যারা অবিশ্বাস করে, তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মানবতার কলঙ্ক শিরক বা অংশীবাদের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে পবিত্র কুরআনের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এ সূরার প্রথম আয়াতেও পবিত্র কুরআন আল্লাহর তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিল হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এভাবে উভয় সূরার যোগসূত্র রয়েছে।

সূরার ফজিলত

আযিশাহ্ [রাদি.] হইতে বর্ণিতঃ সূরা বানী ইসরাঈল ও সূরা আয-যুমার তিলাওয়াত না করা পর্যন্ত নাবী [সাঃ] ঘুমাতে না। সহীহঃ সহীহাহ্ [৬৪১]।

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

১. এ কিতাব পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল হওয়া।

এটা এ সূরার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। এতে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কথা নয় যা অস্বীকারকারীরা বলছে। বরং এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী। তিনি নিজে এ বাণী নাযিল করেছেন। এর সাথে আল্লাহর দু'টি গুণ উল্লেখ করে শ্রোতাদেরকে দু'টি মহাসত্য সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে যাতে তারা এ বাণীকে মামুলি জিনিস মনে না করে, বরং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে। বর্ণিত গুণের একটি হচ্ছে, যে আল্লাহ এ বাণী নাযিল করেছেন তিনি "আযীয" অর্থাৎ এমন মহা পরাক্রমশালী যে কোন শক্তিই তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তাবলী কার্যকরী হওয়া ঠেকাতে পারে না এবং তাঁর বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে এমন কোন শক্তিও নেই। আরেকটি গুণ হচ্ছে, তিনি 'হাকীম' অর্থাৎ এ কিতাবে তিনি যে হিদায়ত দিচ্ছেন তা আগাগোড়া বিজ্ঞোচিত। কেবল কোন অজ্ঞ ও মূর্খই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

২. নিশ্চয় আমরা আপনার কাছে এ কিতাব সত্যসহ নাযিল করেছি। কাজেই আল্লাহর ইবাদাত করুন তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! আমি তোমার নিকট এই কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। এতে তাওহীদ ও রিসালাত, পরকাল এবং যে বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে, তা সত্য। তা যথাযথভাবে বিশ্বাস, গ্রহণ ও পালন করার মাঝেই রয়েছে মানুষের কল্যাণ। সুতরাং তুমি নিজে আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে যাও। আর সারা দুনিয়াবাসীকে তুমি এদিকেই আহ্বান কর। কেননা, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউই নেই। তিনি অংশীবিহীন ও অতুলনীয়।

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত । এর মৌলিক বিষয় দু'টি । এ দু'টি বিষয় বুঝে নেয়া ছাড়া আয়াতটির অর্থ অনুধাবন সম্ভব নয়। একটি বিষয় হচ্ছে, এখানে আল্লাহ ইবাদাত করতে বলা হচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, সে ইবাদাত হবে এমন যা আনুগত্যকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে করা হয়।

ইবাদাত শব্দের শব্দমূল বা ধাতু হচ্ছে عباد । এ শব্দটি আরবী ভাষায় 'স্বাধীন' শব্দের বিপরীত শব্দ হিসেবে 'দাস' বা 'ক্ৰীতদাস' বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে 'ইবাদাত' শব্দের মধ্যে দু'টি অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। একটি অর্থ হচ্ছে পূজা-অর্চনা। আরবী ভাষার বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য অভিধান 'লিসানুল আরবে' আছে التَّسْكُ عِبَادُ اللَّهِ অর্থাৎ والتَّعْبُدُ، تَأْلَهُ لَهُ । আরেকটি অর্থ হচ্ছে সবিনয় আনুগত্য এবং সন্তুষ্টি ও সাগ্রহ আদেশ পালন। অভিধানের এসব নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা অনুসারে আল্লাহর ইবাদাত করা অর্থ শুধু তাঁর পূজা - অর্চনার দাবী করাই নয়, বরং বিনা বাক্যে তাঁর আদেশ নিষেধ পালন, তাঁর শরয়ী আইন- কানুন সন্তুষ্টি চিত্তে সাগ্রহে মেনে চলা এবং তাঁর আদেশ- নিষেধ মনে প্রাণে অনুসরণ করার দাবীও বুঝায়।

আরবী ভাষায় دِينَ (দীন) শব্দ কতিপয় অর্থ ধারণ করেঃ

একটি অর্থ হচ্ছে, আধিপত্য ও ক্ষমতা, মালিকানা ও প্রভুত্বমূলক মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও সার্বভৌম ক্ষমতা এবং অন্যদের ওপর সিদ্ধান্ত কার্যকারী করা ।

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আনুগত্য, আদেশ পালন ও দাসত্ব।

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে অভ্যাস ও পন্থা -পদ্ধতি মানুষ যা অনুসরণ করে।

এ তিনটি অর্থের প্রতি খেয়াল এ আয়াতে 'দীন' শব্দটি এমন কর্মপদ্ধতি ও আচরণকে বুঝায় যা মানুষ কারো শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার এবং কারো আনুগত্য গ্রহণ করার মাধ্যমে অবলম্বন করে । আর "দীন" কে শুধু আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে তাঁর দাসত্ব করার অর্থ হলো "আল্লাহর দাসত্বের সাথে মানুষ আর কাউকে শামিল করবে না বরং শুধু তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁরই অনুসরণ এবং তারই হুকুম আহকাম ও আদেশ পালন করবে । "

إِخْلَاص এর অর্থ হল, বিশুদ্ধচিত্তে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নেক আমল করা। এই আয়াতটি নিয়ত ওয়াজেব ও তাতে ইখলাস থাকা জরুরী হওয়ার একটি দলীল। হাদীসেও খালেস নিয়তের গুরুত্ব (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) 'আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে নেক আমল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করা হবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে (তবে শর্ত হল যে তা সুন্নত মোতাবেক হতে হবে)। পক্ষান্তরে যে আমলে অন্য কোন উদ্দেশ্য মিলিত হবে, তা অগ্রহণযোগ্য হবে।

কুরআন বিভিন্ন জাগায় ইবাদত বা আল্লাহর ডাকার কথা যখনই বলা হয়েছে তখনই উল্লেখ করা হয়েছে এখলাসের কথা বা একনিষ্ঠভাবে ডাকার কথা। আল্লাহ তা'আলাকে এমনভাবে ডাক, যেন ইবাদাত খাঁটিভাবে তারই জন্য হয়; এতে যেন অন্য কারো অংশীদারিত্ব না থাকে; এমন কি গোপন শির্ক অর্থাৎ লোক দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্য থেকেও পবিত্র হওয়া চাই। এতে বোঝা গেল যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থাকেই শরীআতের বিধান অনুযায়ী সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য। এবং আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো মুখলিস শব্দ ব্যবহারের সময়

অনেকাংশে (أَمْرًا) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকার, তাঁর ইবাদত করার আদেশ দেওয়া হচ্ছে। সূরা আ'রাফ ২৯ নং আয়াত, সূরা মু'মিন ৬৫, সূরা আয-যুমার : ১১।

মুখলিস বা একনিষ্ঠ কিভাবে হতে হবে সেটা উদাহরণের সাহায্যে কুরআন বিভিন্ন জায়গা উল্লেখ করা হয়েছে- মনে করুন, নৌকা ভ্রমণে সময় বা সাগরে মাঝে প্রবল ঝড়ের কবলে আপনি পড়লেন। আপনি বুঝতে পারলেন আপনি আবরুদ্ধ হয়ে গেছেন। ঠিক সেই মহুর্তে আল্লাহকে আপনি কতটুকু আন্তরিকতা নিয়ে ডাকবেন? কতটুকু নিষ্ঠার সাথে বাঁচার আকুতি জানাবেন? হ্যাঁ, ঠিক সেইভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার আকুতি নিয়ে আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে ডাকার কথা বলা হয়েছে। কুরআনে উল্লেখ আছে- “তিনিই তোমাদেরকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান। এমনকি তোমরা যখন নৌযানে আরোহন কর এবং সেগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বেরিয়ে এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, তারপর যখন দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে এবং চারদিক থেকে উত্তাল তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা নিশ্চিত ধারণা করে যে, এবার তারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে, তখন তারা আল্লাহকে তার জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে ডেকে বলেঃ আপনি আমাদেরকে এ থেকে বাঁচালে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।” (সূরা ইউনুস ২২) একই ভাবে আরো উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সূরা আনকাবুত ৬৫, সূরা লুকমান ৩২।

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

৩. জেনে রাখুন, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তো এদের ইবাদত এ জন্যে করি যে, এরা আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে। তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে সে ব্যাপারে ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না।

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

এটা একটা বাস্তবসম্মত ও সত্য ব্যাপার। এটা সেই খালেস ইবাদতের তাকীদ যার আদেশ পূর্বের আয়াতে দেওয়া হয়েছে, আর তা হল ইবাদত ও আনুগত্য একমাত্র এক আল্লাহর জন্যই শোভনীয়, তাঁর ইবাদতে কাউকে অংশীদার করা যাবে না এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর যোগ্যও নয়। তবে রসূল (সাঃ)-এরও আনুগত্য করতে হবে, কারণ রাসূলের আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য; অন্য কারোর নয়। এ কথা আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন। কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো একনিষ্ঠ ও অবিমিশ্র দাসত্ব করে তাহলে সে ভ্রান্ত কাজ করে। অনুরূপভাবে সে যদি আল্লাহর দাসত্বের সাথে সাথে অন্য কারো দাসত্বের সংমিশ্রণ ঘটায় তাহলে সেটাও সরাসরি ন্যায় ও সত্যের পরিপন্থী।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করল। ইয়া রসূলুল্লাহ্,(সা) আমি মাঝে মাঝে দান-খয়রাত করি অথবা কারও প্রতি অনুগ্রহ করি। এতে আমার নিয়ত আল্লাহ্ তা' আলার সন্তুষ্টিও থাকে এবং এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহ্ তা' আলা এমন কোন বস্তু কবুল করেন না, যাতে অন্যকে শরীক করা হয়। অতপর তিনি প্রমাণস্বরূপ **أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ** আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন। —(কুরতুবী)

নিষ্ঠা অনুপাতে আল্লাহর নিকট আমল গৃহীত হয়ঃ কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহর কাছে আমলের হিসাব গণনা দ্বারা নয়—ওজন দ্বারা হয়ে থাকে।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

মক্কার কাফের-মুশরিকরা অনুরূপ দুনিয়ার সব মুশরিকও একথাই বলে থাকে যে, আমরা স্রষ্টা মনে করে অন্যসব সত্তার ইবাদাত করি না। আমরা তো আল্লাহকেই প্রকৃত স্রষ্টা বলে মানি এবং সত্যিকার উপাস্য তাকেই মনে করি। যেহেতু তাঁর দরবার অনেক উঁচু। আমরা সেখানে কি করে পৌঁছতে পারি? তাই এসব বুজুর্গ সত্তাদেরকে আমরা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি যাতে তারা আমাদের প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদন আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দেন। অথচ তারা জানত যে, এসব মূর্তি তাদেরই হাতের তৈরি। এদের কোন বুদ্ধি-জ্ঞান, চেতনা-চৈতন্য, ও শক্তি-বল কিছুই নেই। তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের দরবারের মতই ধারণা করে নিয়েছিল।

রাজ দরবারের নৈকট্যশীল ব্যক্তি কারও প্রতি প্রসন্ন হলে রাজার কাছে সুপারিশ করে তাকেও রাজার নৈকট্যশীল করে দিতে পারে। তারা মনে করত, ফেরেশতাগণও রাজকীয় সভাসদবর্গের ন্যায় যে কারও জন্যে সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু তাদের এসব ধারণা শয়তানী, বিভ্রান্তি ও ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমতঃ এসব মূর্তি-বিগ্রহ ফেরেশতাগণের আকৃতির অনুরূপ নয়। হলেও আল্লাহর নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ নিজেদের পূজা-অর্চনায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় এমন যে কোন বিষয়কে তারা স্বভাবগতভাবে ঘৃণা করে। এতদ্ব্যতীত তারা আল্লাহর দরবারে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন সুপারিশ করতে পারে না, যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেন।

সুতরাং তারা একদিকে আল্লাহর বান্দাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে, অপরদিকে আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করেছে। তারা আল্লাহকে অত্যাচারী জালেম বাদশাহদের মত মনে করেছে, অথচ, আল্লাহ সবার ডাকেই সাড়া দেন। তাঁর কাছে কারও অভাব গোপন নাই যে তাকে মাধ্যম ধরে জানাতে হবে। তাছাড়া তারা এ সমস্ত উপাস্যদের ব্যাপারেও সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

একথা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, কেবল তাওহীদের ব্যাপারেই ঐকমত্য হওয়া সম্ভব। শিরকের ব্যাপারে কোন প্রকার ঐকমত্য হতে পারে না। কোন কোন সত্তা আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যমে সে ব্যাপারে দুনিয়ার মুশরিকরা কখনো একমত হতে পারেনি। কারো কাছে কোন দেবতা বা দেবীরা এর মাধ্যমে। কিন্তু তাদের মধ্যেও সব দেবতা ও দেবী সম্পর্কে ঐকমত্য নেই। কারো কাছে চাঁদ, সূর্য, মঙ্গল ও বৃহস্পতি এর মাধ্যম। কিন্তু তাদের মধ্যে কার কি মর্যাদা এবং কে আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যমে সে ব্যাপারে তারাও পরস্পর একমত নয়। কারো

মতে মৃত মহাপুরুষগণ এর মাধ্যম। কিন্তু এদের মধ্যেও অসংখ্য ভিন্নমত বিদ্যমান। কেউ একজন মহাপুরুষকে মানলে আরেকজন অপর একজনকে মানছে। এর কারণ হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন এসব মহাপুরুষ সম্পর্কে তাদের এর ধারণা কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে এমন কোন তালিকাও আসেনি যাতে বলা হয়েছে, অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত। সুতরাং আমাকে পেতে হলে তাদেরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করো। এটা বরং এমন এক আকীদা - যা কেবল কুসংস্কার ও অন্ধভক্তি এবং পুরনো দিনের লোকদেরকে অযৌক্তিক এবং অন্ধ অনুসরণের কারণে মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। তাই ক্ষেত্রে মতের বিভিন্নতা অবশ্যস্বাভাবী।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

আল্লাহ এখানে সেসব লোকের জন্য দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন। একটি كاذب (মিথ্যাবাদী) এবং অপরটি كَفَّارٌ (অস্বীকারকারী)। তাদেরকে 'কাযযাব'বলা হয়েছে এ জন্য যে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে মিথ্যা এ আকীদা বানিয়ে নিয়েছে এবং অন্যদের মধ্যে এ মিথ্যাই প্রচার করছে। আর 'কাফফার' শব্দের দু'টি অর্থ। একটি, ন্যায় ও সত্যের চরম অস্বীকারকারী। অর্থাৎ তাওহীদের শিক্ষা সামনে আসার পর এরা এ ভ্রান্ত আকীদা আঁকড়ে ধরে আছে। আরেকটি, নিয়ামতের অস্বীকারকারী। অর্থাৎ এরা নিয়ামত লাভ করেছে আল্লাহর কাছ থেকে আর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে সেসব সত্তার যাদের সম্পর্কে তারা নিজের থেকেই ধরে নিয়েছে যে, তাদের হস্তক্ষেপের কারণেই তারা এসব নিয়ামত লাভ করেছে।

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۚ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

৪. আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছে বেছে নিতেন। পবিত্র ও মহান তিনি! তিনি আল্লাহ, এক, প্রবল প্রতাপশালী।

আল্লাহ তা'আলা ঐ সব লোকের বিশ্বাসকে খণ্ডন করছেন যারা তার সন্তান সাব্যস্ত করে, যেমন মক্কার মুশরিকরা বলতো যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা, ইয়াহূদীরা বলতো, উযায়ের (আঃ) আল্লাহর পুত্র এবং খৃষ্টানরা বলতো যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের এ আকীদা খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করলে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি সন্তান মনোনীত করতেন। অর্থাৎ তারা যা ধারণা করছে, বিষয়টি তার বিপরীত হতো। এখানে শর্ত ঘটনার জন্যেও নয় এবং সম্ভাবনার জন্যেও নয়। বরং এটা সম্ভবই নয় যে, আল্লাহর সন্তান হবে। এখানে উদ্দেশ্য হলো শুধু ঐ লোকদের অজ্ঞতার বর্ণনা দেয়া। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ অর্থাৎ যদি আমি এই নিকৃষ্ট বিষয়ের (সন্তান গ্রহণের) ইচ্ছা করতাম তবে অবশ্যই আমার নিকটবর্তীদের (মধ্য) হতেই গ্রহণ করতাম, যদি আমাকে (সন্তান গ্রহণ) করতেই হতো।” (২১:১৭) আর এক আয়াতে রয়েছেঃ বল- দয়াময়ের কোন সন্তান থাকলে আমিই তার সর্বপ্রথম 'ইবাদাতকারী হতাম।” (৪৩:৮১)

সুতরাং এসব আয়াতে শর্ত ঘটে যাওয়ায় অসম্ভব বলা হয়েছে। এটা ঘটা বা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনাকে বুঝাবার জন্যে বলা হয়নি। ভাবার্থ এই যে, এটাও হতে পারে না এবং ওটাও হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এসব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

এসব যুক্তি প্রমাণ দিয়েই সন্তান হওয়ার আকীদা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

প্রথম প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সব রকমের ত্রুটি দোষ এবং দুর্বলতা থেকে পবিত্র। একথা সুস্পষ্ট যে, সন্তানের প্রয়োজন হয় অকর্মণ্য ও দুর্বলের। যে ব্যক্তি নশ্বর ও ধবংসশীল সেই সন্তান লাভের মুখাপেক্ষী হয় যাতে তার বংশ ও প্রজন্ম টিকে থাকে। আর কাউকে পালক পুত্রও কেবল সে ব্যক্তিই গ্রহণ করে, যে হয়তো উত্তরাধিকারীহীন হওয়ার কারণে কাউকে উত্তরাধিকারী বানানোর প্রয়োজন অনুভব করে। নয়তো ভালবাসার আবেগে তাড়িত হয়ে কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে। এসব মানবিক দুর্বলতাকে আল্লাহর ওপর আরোপ করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে ধর্মীয় আকীদা - বিশ্বাস রচনা করে নেয়া মূর্খতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টি ছাড়া আর কি ?

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, তিনি এক অদ্বিতীয় এবং একক সত্তার অধিকারী, কোন বস্তু বা দ্রব্যের কিংবা কোন পুরুষের অংশ নন। আর এ বিষয় সুস্পষ্ট যে, সন্তান সমগোত্রীয় হয়ে থাকে। আর দাম্পত্য জীবন ছাড়া সন্তানের কল্পনাই করা যায় না। আর দাম্পত্য সম্পর্কও কেবল সমগোত্রীয়ের সাথেই হতে পারে। সুতরাং একক ও অদ্বিতীয় সত্তা আল্লাহ সন্তান থাকার কথা যে ব্যক্তি বলে সে চরম মূর্খ ও নির্বোধ।

তৃতীয় প্রমাণ হচ্ছে, তিনি বা অপরাজেয় এক মহাশক্তি। অর্থাৎ পৃথিবীতে সব জিনিসই তাঁর অজেয় আধিপত্যের অধীন। এ বিশ্ব - জাহানের কোন কিছুই কোন পর্যায়েই তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তাই কোন জিনিস সম্পর্কেই এ ধরাগা করা যেতে পারে না যে, আল্লাহর সাথে তার কোন আত্মীয়তার বন্ধন আছে।

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

৫. তিনি যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা। সূর্য ও চাঁদকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

সূরা আনকাবুত ৪৪, সূরা ইব্রাহীম ১৯, সূরা নাহল ৩ এই আয়াতগুলোতেও অনুরূপভাবে বলা হয়েছে- তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন।

অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, মিথ্যার ওপর নয়। পরিষ্কার মন-মানসিকতা নিয়ে যে ব্যক্তিই এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে তার কাছে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ পৃথিবী ও আকাশ ধারণা কল্পনার ওপর নয় বরং প্রকৃত সত্য ও বাস্তব ঘটনার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু বুঝবে ও উপলব্ধি করবে এবং নিজের ধারণা ও কল্পনার ভিত্তিতে যে দর্শনই তৈরি করবে তা যে এখানে যথাযথভাবে খাপ খেয়ে যাবে, তার কোন সম্ভাবনা নেই। এখানে তো একমাত্র এমন জিনিসই সফলকাম হতে এবং স্থিরতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, যা হয় প্রকৃত সত্য ও বাস্তব ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। বাস্তব ঘটনা বিরোধী ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা পরিষ্কার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এক আল্লাহ হচ্ছেন এর স্রষ্টা, এক আল্লাহই এর মালিক ও পরিচালক। এ বাস্তব বিষয়টির বিরুদ্ধে যদি কোন ব্যক্তি এ ধারণা

নিয়ে কাজ করতে থাকে যে, এ দুনিয়ার কোন আল্লাহ নেই অথবা এ ধারণা করে চলতে থাকে যে, এর বহু খোদা আছে, যারা মানত ও নজরানার জিনিস খেয়ে নিজেদের ভক্ত-অনুরক্তদের এখানে সবকিছু করার স্বাধীনতা এবং নিশ্চিন্তে নিরাপদে থাকার নিশ্চয়তা দিয়ে দেয়, তাহলে তার এ ধারণার কারণে প্রকৃত সত্যের মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তন ঘটবে না বরং সে নিজেই যে কোন সময় একটি বিরাট আঘাতের সম্মুখীন হবে।

অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নবী যে শিরক পরিহার করার এবং তাওহীদ বিশ্বাসী হবার দাওয়াত দেন, পৃথিবী ও আকাশের সমগ্র সৃষ্টি কারখানাই তার সাক্ষ্য দিয়ে চলছে। এ কারখানা কোন কাল্পনিক গোলক ধাঁধাঁ নয় বরং একটি পুরোপুরি বাস্তব সত্য ব্যবস্থা। এর যেকোনো ইচ্ছা তাকিয়ে দেখো কোথাও থেকে শিরকের সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর সার্বভৌম কর্তৃত্ব কোথাও প্রতিষ্ঠিত দেখা যাবে না। কোন বস্তুর গঠন প্রণালী একথা প্রমাণ করবে না যে, তার অস্তিত্ব অন্য কারোর দান। কাজেই যেখানে এ বাস্তব সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা নির্ভেজাল তাওহীদের নীতিতে পরিচালিত হচ্ছে যেখানে তোমার এ শিরকের চিন্তাধারা -- যার মধ্যে ধারণা ও অনুমান ছাড়া বাস্তব সত্যের গন্ধমাত্রও নেই --- কোথায় জারী হতে পারে? এরপর বিশ্বজগতের নিদর্শনাবলী এবং স্বয়ং মানুষের নিজের অস্তিত্ব থেকে এমন সব সাক্ষ্য - প্রমাণ পেশ করা হয় যা একদিকে তাওহীদ এবং অন্যদিকে রিসালাতের প্রমাণ পেশ করে।

نُور-এর অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর পেঁচিয়ে বা জড়িয়ে দেওয়া, রাত্রিকে দিনের উপর পেঁচিয়ে বা জড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হল, রাত্রি আনয়ন করে দিনকে ঢেকে দিয়ে তার আলো শেষ করে দেওয়া এবং দিনকে রাত্রির পেঁচিয়ে বা জড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হল, দিন আনয়ন করে রাত্রিকে ঢেকে দিয়ে তার অন্ধকার শেষ করে দেওয়া।

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآتَىٰ تُصْرَفُونَ

তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে। তারপর তিনি তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন আট জোড়া আন'আম। তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের তিন প্রকার অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেন। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ?

‘তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে’ অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালাম হতে। আর তাঁর জোড়া হলেন হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম, যাকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আর তিনি তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন আট জোড়া আন'আম

আল-আন'আম বলতে গবাদি পশু বুঝানো হয়েছে। এই আয়াতে সেই চার প্রকার চতুষ্পদ জন্তুর (ছাগল, ভেড়া, উট, গরু) বর্ণনা হয়েছে, যা নর ও মাদা মিলে আট প্রকার হচ্ছে, যার বর্ণনা সূরা আনআমের ১৪৩-১৪৪নং আয়াতে পার হয়ে গেছে। انزَلَ خَلْقَ (সৃষ্টির) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অথবা এক বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা

প্রথমে এই সকল চতুষ্পদ জন্তুকে জাহ্নাতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং পরে তাদেরকে অবতীর্ণ করেন। সুতরাং এক্ষেত্রে إِنْزَال এর মূল অর্থ ধরতে হবে। অথবা إِنْزَال শব্দ এখানে রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কারণ এসব চতুষ্পদ জন্তু ঘাস-পাতা ছাড়া বাঁচতে পারে না। আর ঘাস-পাতার জন্য আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি নিতান্ত জরুরী। তাই মূলতঃ চতুষ্পদ জন্তু আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে বলা যায়।

মাতৃগর্ভের তিন প্রকার অন্ধকারে

প্রথম অন্ধকার মায়ের পেট, দ্বিতীয় গর্ভাশয়, তৃতীয় ঝিল্লী; সেই পাতলা আবরণ যাতে বাচ্চা জড়ানো থাকে।

পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি

অর্থাৎ, ভ্রূণ মাতৃগর্ভে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে, প্রথমে বীর্য, অতঃপর রক্তপিত্ত, অতঃপর গোশতপিত্ত, অতঃপর অস্থির গঠন, তার উপর মাংসের আবরণ। এই সকল স্তর অতিক্রম করার পর পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরী হয়। এটা বিশদভাবে সূরা হজ্জ (২২ : ৫), সূরা মুমিনুন (২৩ : ১৪) এবং সূরা ‘গাফির’(৪০ : ৬৭)-এ আলোচনা আছে।

তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই।

এখানে যুক্তি পেশ করা হচ্ছে যে, তিনিই যখন তোমাদের প্রভু এবং সমস্ত রাজত্ব তাঁরই তখন নিশ্চিতভাবে তোমাদের ইলাহও (উপাস্য) তিনিই। অন্য কেউ কি করে ইলাহ হতে পারে যখন প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তার কোন অংশ নেই। এবং রাজত্বের ক্ষেত্রেও তার কোন দখল নেই। তোমাদের বিবেক - বুদ্ধির কাছে একথা কি করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে, যমীন আসমানের সৃষ্টিকর্তা হবেন আল্লাহ এবং সূর্য ও চন্দ্রকে আনুগত্য গ্রহণকারী আর রাতের পর দিন ও দিনের পর রাত আনয়নকারীও হবেন আল্লাহ। তাছাড়া তোমাদের নিজেদের এবং সমস্ত জীব - জন্তুর স্রষ্টা ও পালনকর্তাও হবেন আল্লাহ অথচ তোমাদের উপাস্য হবে তিনি ছাড়া অন্যরা ?

অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ?

একথাটি চিন্তা করে দেখার মত। এখানে একথা বলা হয়নি যে, তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? বরং বলা হয়েছে এই যে, তোমাদের কোথায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? অর্থাৎ অন্য কেউ তোমাদের বিপথগামী করছে এবং তোমরা তার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সাদামাটা যুক্তিসংগত কথাও বুঝতে পারছো না। এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে দ্বিতীয় যে কথাটি প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে ‘তোমরা’ বলে সম্বোধন করে যারা ফিরিয়ে নিচ্ছে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়নি, বরং যারা তাদের প্রভাবে পড়ে ফিরে যাচ্ছিলো তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে, কিছুটা চিন্তা - ভাবনা করলে যা সহজেই বোঝা যায়। যারা ফিরিয়ে নিচ্ছিলো তারা সে সমাজে সবার চোখের সামনেই ছিলো এবং সবখানে প্রকাশ্যেই কাজ করছিলো। তাই তাদের নাম নিয়ে বলার প্রয়োজন ছিলো না। তাদের সরাসরি সম্বোধন করাও ছিলো নিরর্থক। কারণ, তারা নিজেদের স্বার্থের জন্যই মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্ব থেকে ফিরতে এবং অন্যদের দাসত্বে শৃঙ্খলিত করতে এবং করিয়ে রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। এটা জানা কথা যে, এ ধরনের লোকদের বুঝলেও তারা তা বুঝতে রাজি ছিল না। কারণ, না বুঝার মধ্যেই তাদের স্বার্থ নিহিত ছিল এবং বুঝার পরও তারা তাদের স্বার্থ ত্যাগ করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তবে জনসাধারণ যারা তাদের প্রতারণা ও চতুরতার ফাঁদে পতিত হচ্ছিলো তারা ছিল করুণার পাত্র। এ কারবারে তাদের কোন স্বার্থ ছিল না। তাই তাদেরকে বুঝলে বুঝতে পারতো এবং চোখ কিছুটা খুলে যাওয়ার পরে তারা এও দেখতে পারতো যে, যারা তাদেরকে আল্লাহর নিকট থেকে সরিয়ে অন্যদের আস্তানার পথ দেখাচ্ছে তারা

তাদের এ কারবার থেকে কি স্বার্থ হাসিল করছে। এ কারণেই গোমরাহীতে নিষ্কেপকারী মুষ্টিমেয় লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে গোমরাহীর দিকে অগ্রসরমান জনসাধারণকে সম্বোধন করা হচ্ছে।

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

৭. যদি তোমরা কুফরী কর তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি তার বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। এবং যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে তিনি তোমাদের জন্য তা-ই পছন্দ করেন। আর কোন বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের রবের কাছেই তোমাদের ফিরে যাওয়া। তখন তোমরা যা আমল করতে তা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। নিশ্চয় অন্তরে যা আছে তিনি তা সম্যক অবগত।

তোমাদের কুফরীর কারণে তাঁর প্রভুত্বের সামান্যতম ক্ষতিও হতে পারে না। তোমরা মানলেও তিনি আল্লাহ, না মানলে ও তিনি আল্লাহ আছেন এবং থাকবেন। তাঁর নিজের ক্ষমতায়ই তাঁর কর্তৃত্ব চলছে। তোমাদের মানা বা না মানাতে কিছু এসে যায় না। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ বলেন:

"হে আমার বান্দারা, যদি তোমরা আগের ও পরের সমস্ত মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার কোন সর্বাধিক পাপিষ্ঠ ব্যক্তির মত হয়ে যাও তাতেও আমার বাদশাহীর কোন ক্ষতি হবে না।" (মুসলিম)।

এখানে 'কুফর' এর বিপরীতে 'ঈমান' শব্দ ব্যবহার না করে 'শোকর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে আপনা থেকেই এ বিষয়ের ইংগিত পাওয়া যায় যে, কুফরী প্রকৃতপক্ষে অকৃতজ্ঞতা ও নেমক হারামির নাম আর ঈমান প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনিবার্য দাবী। যে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীর সামান্য অনুভূতিও আছে সে ঈমান ছাড়া অন্য কোন পথ গ্রহণ করতে পারে না। এ কারণে 'শোকর' ও 'ঈমান' এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যে, যেখানে শোকর থাকবে সেখানে ঈমানও অবশ্যই থাকবে। অপর দিকে যেখানে কুফরী থাকবে সেখানে শোকর বা কৃতজ্ঞতা থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ কুফরীর সাথে "শোকরের" কোন অর্থ হয় না।

তোমাদের মধ্যকার প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে তার কাজ কর্মের জন্য দায়ী। কেউ যদি অন্যদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিংবা তার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য কুফরী করে তাহলে সে লোকেরা তার কুফরীর বোঝা নিজেদের মাথায় উঠিয়ে নেবে না। বরং তাকেই তার কাজের পরিণাম ভোগ করার জন্য রেখে দেবে। সুতরাং কুফরীর ভ্রান্তি এবং ঈমানের সত্যতা যার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে তার উচিত ভুল আচরণ পরিত্যাগ করে সঠিক আচরণ গ্রহণ করা এবং নিজের বংশ, জাতি - গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সাথে থেকে নিজেকে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত না বানানো।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا
لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

৮. আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একাগ্রচিতে তার রবকে ডাকে। তারপর যখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে ভুলে যায় তার আগে যার জন্য সে ডেকেছিল তাকে এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়, অন্যকে তার পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য। বলুন, কুফরীর জীবন তুমি কিছুকাল উপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি আগুনের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার প্রতিপালককে ডেকে থাকে। অর্থাৎ মানুষ তার প্রয়োজনের সময় অত্যন্ত বিনয় ও মিনতির সাথে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে এবং তাঁকে এক ও অংশীবিহীন মেনে নেয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ব্যতীত অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাকে। তারা অন্তর্হিত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।” (১৭:৬৭) এ জন্যেই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় তার পূর্বে যার জন্যে সে ডেকেছিল। অর্থাৎ পূর্বে বিপদের সময় যে আল্লাহকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ডেকেছিল তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে যায়। যেমন মহামহিমাস্থিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ যখন মানুষকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাকে আহ্বান করে থাকে, অতঃপর যখন আমি তার বিপদ দূর করে দিই। তখন সে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যে, তাকে বিপদ স্পর্শ করার সময় সে যেন আমাকে আহ্বান করেনি।” (১০:১২) অর্থাৎ নিরাপদে থাকা অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করতে শুরু করে দেয়। মহামহিমাস্থিত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও- কুফরীর জীবন অবস্থায় কিছুকাল উপভোগ করে নাও। বস্তুত তুমি জাহান্নামীদের অন্যতম।” এটা ধমক ও ভীতি প্রদর্শন। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলঃ তোমরা (কিছুকাল) উপকার লাভ ও সুখ ভোগ করে নাও, তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল জাহান্নাম। (১৪:৩০) আরো বলেনঃ আমি তাদেরকে কিছুকাল সুখ ভোগ করাব, অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে আসতে বাধ্য করবো। (৩১:২৪)

إِذَا هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

৯. যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, (সে কি তার সমান, যে তা করে না?) বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

কাফের ও মুশরিকের তো এই অবস্থা যা বর্ণনা করা হল। পক্ষান্তরে আর এক ব্যক্তি যে সুখে-দুঃখে, আল্লাহর সামনে অক্ষমতা ও আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে সিজদা ও কিয়াম অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। তার মন আখেরাতের ভয়ে ভীত এবং সে প্রভুর রহমতের আশাধারী হয়। অর্থাৎ ভয় ও আশা উভয় অবস্থাই তার মধ্যে পাওয়া যায়; যা প্রকৃত ঈমান। এরা দুইজন কি সমান হতে পারে? না, কক্ষনই না। ভয় ও আশা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আনাস (রাঃ) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃত্যু মুখে পতিত এক ব্যক্তির নিকট গেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার অবস্থা কি?” সে ব্যক্তি বলল, ‘আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখছি এবং স্বকৃত পাপের জন্য ভয়ও করছি।’ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “এই অবস্থায় যদি কোন বান্দার মনে এই দু’টি কথা একত্রিত হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে ঐ বস্তু প্রদান করবেন, যে বস্তুর সে আশা করে এবং সেই বস্তু থেকে বাঁচিয়ে নেবেন, যার সে ভয় করে।” (তিরমিযী -ইবনে মাজাহ)

যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?

সেই ব্যক্তি যে জানে যে, আল্লাহ শাস্তি ও শাস্তির যে ওয়াদা করেছেন তা সত্য এবং ঐ ব্যক্তি যে এ কথা জানে না, এরা দুইজন সমান হতে পারে না। একজন বিজ্ঞ এবং অপরজন অজ্ঞ। যেমন শিক্ষা ও মূর্খতা এক নয়, অনুরূপ শিক্ষিত ও মূর্খ সমান নয়। হতে পারে যে, এখানে আলেম ও জাহেলের উদাহরণ দিয়ে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, যেমন এরা দুইজন সমান নয়, অনুরূপ আল্লাহর বাধ্য ও অবাধ্য বান্দা, দুইজনে সমান হতে পারে না। কেউ কেউ এর অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, আলেম (জ্ঞানী) বলে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে তার ইলম (জ্ঞান) অনুযায়ী আমল করে। কারণ সেই (প্রকৃত আলেম যে তার) ইলম দ্বারা উপকৃত হয়। আর যে নিজ ইলম অনুযায়ী আমল করে না, সে ঠিক যেন অজ্ঞ। এই অর্থ অনুযায়ী এখানে আমলকারী ও বেআমল ব্যক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে, এরা দুইজন এক সমান নয়।

বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

যারা মু’মিন, কাফের নয়; যদিও তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ভাবে। যখন তারা নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা-ভাবনাই করে না এবং শিক্ষা ও নসীহতই অর্জন করে না, তখন তারা ঠিক যেন চতুষ্পদ জন্তুর মত জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত।

- এ গোটা সূরাটিকে একটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতারূপে পেশ করা হয়েছে। এটা একটা নসীহত।
- প্রথম আয়াতে আল্লাহর দুইটি গুণের কথা বলা হয়েছে- ১. আযীয ২. হাকীম
- প্রথম দুই আয়াতে কুরআনের দুইটি পরিচয় দেওয়া হয়েছে- ১. এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে ২. এটি সত্যসহ নাযিল হয়েছে।
- তিনটি যুক্তি প্রমাণ দিয়েই আল্লাহ সন্তান হওয়ার আকীদা প্রত্যাখ্যান করেছেন-
 - প্রথম যুক্তি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সব রকমের ত্রুটি দোষ এবং দুর্বলতা থেকে পবিত্র।
 - দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে, তিনি এক অদ্বিতীয় এবং একক সত্তার অধিকারী, কোন বস্তু বা দ্রব্যের কিংবা কোন পুরুষের অংশ নন।
 - তৃতীয় যুক্তি হচ্ছে, তিনি বা অপরাজেয় এক। এ বিশ্ব - জাহানের কোন কিছুই কোন পর্যায়েই তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তাই কোন জিনিস সম্পর্কেই এ ধরাণা করা যেতে পারে না যে, আল্লাহর সাথে তার কোন আত্মীয়তার বন্ধন আছে।
- আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য নাযিল করেছেন আট জোড়া আন'আম (গাবাদি পশু)। এবং মানুষদেরকে তাদের মাতৃগর্ভের তিন প্রকার অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেন।
- আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ (মুখলিস) হয়ে।
- কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি অপরের ভার বহন করবে না।
- সাধারণত, যখন একজন মানুষ কষ্টে পতিত হয়, তখন সে আল্লাহর দিকে ফিরে যায় এবং একাগ্রচিত্তে তার রবকে ডাকে। কিন্তু যখন তারা কোন বিপদ-মুসিবত দূরে চলে যায় এবং সে আল্লাহর অনুগ্রহ/নিয়ামত উপভোগ করে, তখন তারা আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া ভুলে যায়। মানুষের এই ধরনের আচরণকে নিন্দা করা হয়েছে এই সূরার। মানুষ যখন বিপদে-দুঃখে থাকবে তখন সবরের সাথে আল্লাহর সাহায্য চাইবে যখন অনুগ্রহ/নিয়ামত উপভোগ করে সুখে থাকবে তখন শোকর/কৃতজ্ঞতার সাথে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করবে। এটাই করা উচিত মুমিনদের।
- আল্লাহ আরেক শ্রেণী মানুষের প্রশংসা করেছেন যারা রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে, আল্লাহকে ডাকে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে,
- অজ্ঞ ও জ্ঞানী মানুষ কখনো সমান হতে পারে না।
- যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ভালো কাজ করে, আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
- যারা আগুনে নিপতিত হয়েছে তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না